এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো

প্রভাষ আমিন

ঢাকার রাস্তায় যে কোনো সিগন্যালে গাড়ি দাঁড়ালেই চারপাশ থেকে ছুটে আসে অনেকগুলো শিশু। কেউ ফুল নিয়ে আসে, কেউ একটি ডাস্টার নিয়ে গাড়ি মুছতে শুরু করে। কেউবা অন্য কোনো পণ্য বিক্রি করতে আসে। কোনো মায়ের কোলে থাকে দুগ্ধপোষ্য শিশু। সিগন্যালের পাশেই রোড ডিভাইডারে দেখি অনেকের সংসার। সেখানে শিশুরা খেলছে, হাসছে, কাঁদছে, গড়াগড়ি খাচ্ছে। সিগন্যালে দাঁড়ানো গাড়ির স্রোতের ফাঁকে ফাঁকে এই শিশুরা নিজেদের জীবন-জীবিকার সংস্থান করে যাচ্ছে। আমার খালি ভয় হয়, সিগন্যাল ছেড়ে দিলে গাড়িগুলো সব যখন একসাথে ছুটবে, এই শিশুগুলো নিরাপদে থাকতে পারবে তো। সিগন্যাল ছেড়ে দিলেও অনেকক্ষণ আমি পেছনে তাকিয়ে থাকি, দেখি সবগুলো শিশু নিরাপদে রাস্তার পাশে যেতে পারলো কি না। প্রতিবারই আমার আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হয়। ম্যাজিকের মতো গাড়ির সমুদ্র থেকে শিশুরা নিজেদের নিরাপদ করে রাখে। লড়াইটা যখন অস্তিত্বের, টিকে থাকার, বেঁচে থাকার; তখন আসলে এই শিশুদের এইসব নিরাপত্তা নিয়ে ভাবলে চলে না। 'সারভাইভেল অব দ্যা ফিটেস্ট'দের এই পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে নিজেদের সবসময় ফিট রাখতে হবে।

সাংবাদিকতার একদম শুরুর দিকে, নব্বইয়ের দশকে সাপ্তাহিক বিচিন্তা সম্পাদক মিনার মাহমুদ আমাকে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলেন টেম্পোর হেলপারদের নিয়ে রিপোর্ট করতে। আপনারাও নিশ্চয়ই জানেন, প্রতিদিন দেখছেন, ঢাকার অধিকাংশ টেম্পো বা হিউম্যান হলারের হেলপার হলো শিশু। তারা যেভাবে টেম্পোর পাদানিতে ঝুলে থেকে দায়িত্ব পালন করে, ভাড়া আদায় করে, ড্রাইভারদের সিগন্যাল দেয়; তা অতি ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু এখানেও অস্তিত্বের প্রশ্নে নিরাপত্তার চেয়ে ফিট থাকাটাই জরুরি। যেমনটা বলছিলাম, ক্যারিয়ারের প্রথম দিককার অ্যাসাইমেন্টের কারণে টেম্পোর হেলপারদের অনেকের সাথে কথা বলেছিলাম। কাছ থেকে দেখেছিলাম তাদের কষ্ট, তাদের পরিশ্রম, তাদের জীবনযাত্রা। এত কষ্টের মাঝেও তারা আনন্দ খুঁজে নেয়। পাশের টেম্পোর সাথে প্রতিযোগিতা করে, মজা করে। আমি যে টেম্পোতে বসেছিলাম, তার হেলপার, পাশের টেম্পোর হেলপারকে বলছিল, 'এই তোর চাক্কাত পাম নাই।' পাশের জন আবার বলছিল, 'আগে নিজের চাক্কার খবর ল, হেরপর আমারটা দেহিস।' দুজনই শিশু, দুজনের এই খুনসুটি চলছিল চলন্ত টেম্পোতে। এই যে তাদের হাসি আনন্দ, এর পেছনে কিন্তু লুকিয়ে আছে অনেক বেদনার গল্প। কেউ কিন্তু ইচ্ছা করে টেম্পোতে কাজ করতে আসেনি। তারা কাজ না করলে ঘরে চুলা জ্বলবে না, তাই তারা বাধ্য হয়ে কাজে নেমেছে। হয়তো বাবা মারা গেছে বা বাবা অসুস্থ, হতে পারে বাবা তাদের মা'কে ফেলে চলে গেছে। অনেক পরিবারে সেই শিশুটিই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। যার স্কুলে যাওয়ার কথা, হাসি-আনন্দে মেতে থাকার কথা; তাকেই নেমে পড়তে হয় জীবনযুদ্ধে।

এই শিশু শ্রমিকদের তাকালে নিজেকে বারবার আমার অপরাধী মনে হয়। বারবার আমি আমার সন্তানের দিকে তাকাই। এসএসসি পাস করা পর্যন্ত আমাদের একমাত্র সন্তান প্রসূনকে তার মা রাস্তা পার হওয়া তো দূরের কথা, বাসার সামনের দোকানেও পাঠায়নি। আমাদের ছেলে ঢাকার ভালো স্কুলে পড়েছে, গাড়ি করে স্কুলে আসা-যাওয়া করেছে। ভালো খাবার খেয়েছে। চেষ্টা করেছি সাধ্যমত তার সব শখ-আহ্লাদ পূরণ করতে। কিন্তু সেই টেম্পোর হেলপার বা রাস্তায় ফেরি করে ফুল বিক্রি করা শিশুটির সাথে আমার ছেলের ফারাক কোথায়? আমার ছেলে যা যা সুবিধা পেয়েছে, সেই সুবিধা তো তারও প্রাপ্য। এখানে নিয়তি দুজনকে আলাদা করে দিয়েছে। জন্মের ওপর আমাদের কারো হাত নেই। সেই টেম্পোর হেলপারটি যদি আমাদের সন্তান হতো, সেও নিশ্চয়ই এই সুবিধাগুলো পেতো। একটি শিশু জন্মের পর সে সবকিছুর ঊর্ধ্বে থাকে। সেই শিশুর কোনো অপরাধ থাকে না, নিজের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতা থাকে না। সব শিশুই আসলে আমাদের শিশু। মুখে বললেও বাস্তবে এর প্রয়োগ ঘটনো সম্ভব হয় না। নিয়তি, বৈষম্য, শ্রেণি বিভাজন শিশুদের ভাগ্য আলাদা করে দেয়।

এমনিতে ১৪ বছরের নিচে কোনো শিশুকে তার পরিবারের লিখিত অনুমতি ছাড়া উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ দেওয়া বা কাজ করিয়ে নেওয়াকে শিশুশ্রম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী শিশু শ্রম অপরাধ। শিশুদের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগকারীর শাস্তিও হতে পারে। শিশু শ্রম নিরসনে এই আইনের কঠোর প্রয়োগ

নিশ্চিত করলে সেটা শিশুদের পক্ষে যাবে না। বরং কাজ করতে না পারলে সেই শিশুটি বা তার পরিবারকে না খেয়ে থাকতে হবে। তাই শুধু আইন করলে বা স্লোগান দিলে শিশু শ্রম দূর করা যাবে না। সেই শিশু বা তার পরিবারের বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

শুরুতে যেমনটি বলছিলাম, শুধু টেম্পোর হেলপার বা রাস্তার সিগন্যালে ফেরি করা নয়; বাংলাদেশে শিশু শ্রমিকদের কাজের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। ছোট খাট কল-কারখানা থেকে শুরু করে পাথর ভাঙা, ভিক্ষাবৃত্তি করা, বাসা বাড়িতে কাজ করা, গার্মেন্টস, গ্যারেজ, দোকান, হোটেল-রেস্টুরেন্টে শিশুরা কাজ করে। এমনকি বিড়ি শিল্পের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও শিশুদের নিয়োগ করা হয়। গ্রামে কৃষিকাজে শিশুদের লাগিয়ে দেওয়া হয়। নিয়োগের ক্ষেত্রে শিশুদের শারীরিক-মানসিক নিরাপত্তার কথা একদমই ভাবা হয় না। নিয়োগকারীরা শিশুদের নিয়োগের ব্যাপারে বাড়তি আগ্রহ দেখান। কারণ শিশুদের ইচ্ছামতো ঠকানো যায়। পেটেভাতে বা নামকাওয়াস্তে মজুরিতে শিশুরা দিনের পর দিন কাজ করতে বাধ্য হয়। ব্যতিক্রম বাদ দিলে শিশু শ্রমিকরা বড় হয়ে শ্রমিকই হয়। তাদের জীবনীশক্তি অল্পতেই ফুরিয়ে যায়। তাদের আয়ুও কম হয়। অনেক শিশু ছেলেবেলা থেকে এই বঞ্চনা, বৈষম্য দেখতে দেখতে বিদ্রোহী হয়। বড় হয়ে সে মাদকাসক্ত হয়, ছিনতাইকারী হয়, মাস্তান হয়। কন্যাশিশুদের অনেকে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। আমাদের ভবিষ্যত এভাবেই আমাদের চোখের সামনে ধ্বংস হয়। আমাদের কিছুই করার থাকে না।

বাংলাদেশে কম বেশি ৫০ লাখ শিশু স্কুল ফেলে কাজে নেমে পড়ে। সংখ্যাটা অনেক বড়। মুখে বললেই এই ৫০ লাখ শিশুকে ফেরানো যাবে না। কিন্তু এই ৫০ লাখ শিশুকে যদি আমরা স্কুলে পাঠাতে পারতাম, পড়াশোনা করাতে পারতাম। তাহলে তারাও জাতি গঠনে অবদান রাখতে পারতো। বোঝা না হয়ে জাতির সম্পদে পরিণত হতে পারতো। আগেই যেমনটি বলেছি, আইন করে বা বক্তৃতা দিয়ে শিশুশ্রম নিরসন সম্ভব নয়। শিশুশ্রম বন্ধে আগে কাজে নিয়োজিত ১৪ বছরের কম শিশুদের চিহ্নিত করতে হবে। তাদের পরিবারের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে হবে।

সামাজিক নিরাপত্তায় সরকারের নানা প্রকল্প আছে। তার আওতায় শিশু শ্রমিকদের পরিবারের সমস্যার সমাধান করতে হবে। অভিভাবকদের বোঝাতে হবে শিশুদের সম্ভাবনা। লাগবে সামাজিক সচেতনতাও। শিশুদের জন্য শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, মেয়েদের দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও বিনামূল্যে শিক্ষাসামগ্রী প্রদান করা, উপবৃত্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, মিড ডে মিল সরকারের এসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ শিশুদের কর্মক্ষেত্র থেকে স্কুলে ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ পালন করবে। এই প্রকল্পগুলো আরো দক্ষতার সাথে এবং টার্গেট শিশুদের আওতায় এনে কার্যকর করলে শিশুশ্রম কমে আসবে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যক্তি ও সামাজিক সংগঠনও শিশুশ্রম নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সামর্থবান ব্যক্তিরা যদি একটি করে শিশু বা তার পরিবারের দায়িত্ব নেয়, তাহলেও কমে আসতে পারে শিশুশ্রম। নইলে মিষ্টি কথায়, ভালো কথায় শিশুদের স্কুলে ফেরানো যাবে না। তবে যতদিন শিশুশ্রম পুরোপুরি বন্ধ করা না যাচ্ছে, ততদিন অন্তত এটা নিশ্চিত করতে হবে শিশুদের যেন শিশুদের উপযোগী, কম পরিশ্রমের কাজ দেওয়া হয়। শিশুদের কাজের ক্ষেত্র যেন তাদের জন্য নিরাপদ হয়। তারা যেন ন্যায্য মজুরি পায়, নিশ্চিত করতে হবে তাও।

দেশে শিশুদের সমস্যা শুধু শ্রমে নয়, দারিদ্র্যে নয়, বৈষম্যে নয়; শ্রমঘন কাজে নিয়োজিত শিশুরা নানাভাবে বঞ্চনার শিকার তো হয়ই, নানা নিপীড়নও সইতে হয় তাদের। চড়-থাপ্পড়, মারধোর তো মামুলি ব্যাপার; যৌন নিপীড়নও যেন তাদের বোনাস। বিভিন্ন বাসাবাড়িতে কর্মরত গৃহকর্মীদের নির্মম শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি যৌন নিপীড়নও সইতে হয় নিয়মিত। তবে শিশুদের যৌন নিপীড়ন শুধু দরিদ্র শিশুদের নয়, সব শ্রেণির শিশুদের ভয়াবহ এই নির্যাতন সইতে হয়। যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে ছেলেশিশু, কন্যাশিশু সমান ঝুঁকিতে থাকে। বিভিন্ন মাদ্রাসায় ছেলেশিশুদের বলাৎকারের খবর প্রায়ই আসে। তবে যতটা খবর আসে, পরিস্থিতি তারচেয়ে অনেক ভয়াবহ। শিশুরা ভয়ে লজ্জায় মুখ খোলে না। দিনের পর দিন মুখ বুজে নির্যাতন সয়ে যায়। দুয়েক ক্ষেত্রে নির্যাতন ধরা পড়ে গেলে বা দৃশ্যমান হলে তা নিয়ে আলোচনা হয়, হৈচৈ হয়; কিন্তু বিচার হয় না। দেশে ধর্ষণের জন্য কঠোর আইন থাকলেও ছেলেশিশুরা ধর্ষণের শিকার হলে তার প্রতিকার মেলে কম। শুধু কর্মক্ষেত্রে বা মাদ্রাসায় নয়; বাংলাদেশের শিশুরা নিজের ঘরেও নিরাপদ নয়। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের কাছেও শিশুরা নির্যাতনের শিকার হয়। আদর করার ছলেও অনেকে নির্যাতন করে। 'ব্যাড টাচ' শিশুরা বুঝলেও অভিভাবকরা বুঝতে চান না। শিশুদের অভিযোগ তারা আমলে নেন না। বরং তাকে উল্টো বকা দিয়ে মুখ বন্ধ রাখতে বাধ্য করা হয়। তাতে নির্যাতনকারী আরো সুযোগ পায়। ব্যাড টাচ থেকে আরো বড় নিপীড়ন বা ধর্ষণের ঘটনা পর্যন্ত ঘটে। কিন্তু আগের অভিজ্ঞতায় শিশুটি আর মুখ খোলে না। মুখ বুজে সয়ে যায় নির্যাতন। যৌন নির্যাতনের ভয়াবহতা একটি শিশু বয়ে বেড়ায় সারাজীবন। পারিবারিক নির্যাতন বা ধর্ষণের খবর প্রকাশিত হলেও তার বিচার প্রায় হয়ই না। নির্যাতনকারীও নিজেদের লোক হওয়ায় পারিবারিক মর্যাদা রক্ষায় পুরো ঘটনাটির চেপে যাওয়া হয়। কন্যাশিশু হলে সেই ধর্ষকের সাথে বা অন্য কারো সাথে দ্রুত বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। আর ছেলেশিশুকে মুখ বন্ধ রাখতে বাধ্য করা হয়। বড় জোর নির্যাতনকারীকে একটু ভর্ৎসনা, দুয়েকটা চড়-থাপ্পরেই মিটে যায় বিচার। কিন্তু কিছু বোঝার আগেই একটি শিশুর সাথে এই অন্যায় তার মনোজগতে কতটা বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে, আমরা ভেবেও দেখি না।

এভাবে ঘরে-বাইরে শিশুদের জন্য অনিরাপদ এবং ভয়ঙ্কর এক জগত তৈরি করে রেখেছি আমরা। প্রতিটি শিশুই আসলে দেবশিশু। তারা পৃথিবীতে আসে নিষ্পাপ হিসেবে। আমরা বৈষম্যে, বঞ্চনায়, নির্যাতনে, নিপীড়নে তাদের ঢেলে দেই অন্ধকারের দিকে। অথচ প্রতিটি শিশুকে সব কালিমা থেকে, অন্যায় থেকে, কষ্ট থেকে দূরে রাখা আমাদের সবার দায়িত্ব। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল রাখতে শিশুদের বর্তমানটা আনন্দময় ও নিরাপদ রাখতে হবে। এ দায়িত্বটা আমাদের সবার- ব্যক্তির, সমাজের, রাষ্ট্রের।

সুকান্ত ভট্টাচার্য অনেক আগেই তার ছাড়পত্র কবিতায় লিখে গেছেন-

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব- তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।